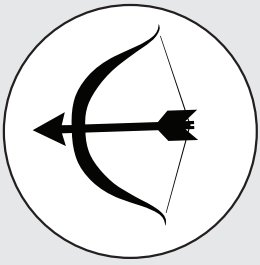

প্রতিরোধের ২৪ বছর

মুক্তির লক্ষ্যে ইউপিডিএফ-এর পতাকাতলে সমবেত হোন, লড়াই জোরদার করুন!

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট
(ইউপিডিএফ)-এর
দুই যুগ পূর্তি উপলক্ষে
কেন্দ্রীয় কমিটির
বক্তব্য

প্রতিরোধের ২৪ বছর

মুক্তির লক্ষ্যে ইউপিডিএফ-এর পতাকাতলে সমবেত হোন, লড়াই জোরদার করুন!

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর
দুই যুগ পূর্তি উপলক্ষে
কেন্দ্রীয় কমিটির
বক্তব্য

১

পার্বত্য চট্টগ্রামে পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আন্দোলনরত দল ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর প্রতিষ্ঠার দুই যুগ পূর্ণ হলো। পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষর ও জনসংহতি সমিতির আত্মসমর্পনের প্রেক্ষাপটে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন যখন নেতৃত্বহীন হয়ে পড়ে, তখনই জাতীয় প্রয়োজনে ও সময়ের দাবিতে ১৯৯৮ সালের ২৬ ডিসেম্বর এই পার্টি জন্ম লাভ করে। চুক্তি নিয়ে অতি উচ্ছ্বাস, উন্মাদনা ও বিভ্রান্তির ধূম্রজাল ভেদ করে সে সময় একমাত্র ইউপিডিএফ-ই জনগণের সামনে সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ নিয়ে হাজির হয় এবং প্রতারণার শিকার জনগণকে হতাশার অতল গহ্বর থেকে উদ্ধার করে আন্দোলনের সঠিক দিশা দিতে সক্ষম হয়। সেদিন ইউপিডিএফের জন্ম না হলে জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা তথা জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম পরিচালনা করার মতো কোন দলের অস্তিত্ব থাকতো না। বলার অপেক্ষা রাখে না, এ সত্য আজ সবার কাছে অত্যন্ত পরিস্কার। এ কারণে ইউপিডিএফের আবির্ভাব পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনীতিতে এক যুগান্তকারী ঐতিহাসিক ঘটনা।

২

প্রতিষ্ঠার দুই যুগ পূর্তির মহতী উপলক্ষে আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল স্তরের জনগণ, বিদেশে প্রবাসী পাহাড়ি সম্প্রদায়, পার্টি ও আমাদের আন্দোলনের সমর্থক, শুভাকাঙ্ক্ষী ও শুভানুধ্যায়ী তথা সমগ্র দেশবাসীকে প্রাণঢালা শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই বিশেষ দিনে আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি যারা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। আমরা বিশেষভাবে স্মরণ করি শহীদ ইউপিডিএফ-এর নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের, যাদের বুকের তাজা রক্তে রচিত হয়েছে আমাদের পার্টি ও সংগ্রামের ২৪ বছরের বীরত্বপূর্ণ ইতিহাস। যারা পার্টিগত দায়িত্ব পালনকালে শত্রুর হাতে

নির্যাতিত, নিগৃহীত ও পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন এবং যারা বিনা অপরাধে বন্দী হয়ে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে ধুঁকে ধুঁকে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন, আমরা তাদের কথাও স্মরণ করছি। আমাদের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনে পার্টি সব সময় এদেশের বাঙালি প্রগতিশীল দল, সংগঠন ও ব্যক্তি বিশেষের সমর্থন ও সহানুভূতি লাভ করেছে; দুই যুগ পূর্তিতে পার্টি তাদের অবদানের কথাও গভীরভাবে স্মরণ করছে। আমরা দৃঢ়ভাবে বলতে চাই, কোন ধরনের দমনপীড়ন চালিয়ে, জেল-জুলুম ও ষড়যন্ত্র করে আমাদের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলন থেকে পার্টিকে বিচ্যুত করা যাবে না। পার্টির শত শত নেতাকর্মী জীবনের সকল প্রকার ঝুঁকি নিয়ে জনগণের সাথে থেকে নিরলসভাবে তাদের জাতীয় দায়িত্ব পালন করে চলেছে। আমাদের এসব বীর লড়াকু সহযোদ্ধাদের জানাই বিপ্লবী অভিবাদন।

৩

ইউপিডিএফের গত ২৪ বছরের ইতিহাস হলো একদিকে পার্টি ও জনগণের ওপর নিষ্ঠুর দমনপীড়ন ও অন্যদিকে তার বিরুদ্ধে অবিরাম প্রতিরোধ ও সংগ্রামের ইতিহাস। রাজনৈতিক মঞ্চে একদিকে পার্টি ও জনগণ এবং অন্যদিকে প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী ও তার পোষ্য দালাল ও পেটোয়া বাহিনী -- এই হলো বর্তমান পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতির প্রধান দিক। জন্মলগ্ন থেকেই পার্টিকে প্রবল প্রতিপক্ষের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করতে হয়েছে। একদিকে আদর্শচ্যুত ও দেউলিয়াগ্রস্ত জেএসএসের ইউপিডিএফ নির্মূলের কর্মসুচী ও অন্যদিকে ভবিষ্যত আন্দোলনের বীজ ধ্বংস করে দেয়ার সরকারী নীতি -- এই দুইয়ের বিরুদ্ধে পার্টিকে যুগপৎ লড়াই চালাতে হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। মরণপণ এই লড়াইয়ে পার্টি তার ৩৩৮ জন কর্মী ও সমর্থককে হারিয়েছে, কিন্তু তারপরও পার্টি ও আন্দোলনের অগ্রযাত্রাকে রুদ্ধ করা যায়নি। বরং পার্টি নিরন্তর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দিনে দিনে জনগণের আস্থা অর্জন এবং সুদৃঢ় গণভিত্তি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে, অন্যদিকে শাসকগোষ্ঠীর কোলে আশ্রয় নেয়া জেএসএস দ্বিধাবিভক্ত হয়ে এখন নিজের অস্তিত্ব নিয়ে গভীর সংকটে নিমজ্জিত হয়েছে।

সরকার-শাসকগোষ্ঠীর দমনপীড়নের খড়্গ কেবল ইউপিডিএফের মাথার উপর পড়েছে তাই নয়, গত ২৪ বছরে পাহাড়ি জনগণের উপর ১৯টি বড় ধরনের হামলার ঘটনা ঘটেছে। বিশেষ করে ভূমি বেদখলকে কেন্দ্র করে এসব হামলা চালানো হয়েছে। আর এই হামলা ও ভূমি বেদখলের বিরুদ্ধে একমাত্র যে পার্টি সুদৃঢ় ও কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে তা হলো আমাদের এই পার্টি। ২০০৭-৮ সালের জরুরী অবস্থার সময় যখন পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্বত্র ভূমি বেদখল তীব্র ও মহামারী আকার ধারণ করে, তখন তার প্রতিরোধে ইউপিডিএফ ছাড়া আর কোন দল এগিয়ে

আসেনি। পার্টির নেতৃত্বে গড়ে ওঠা গণপ্রতিরোধের কারণে ভূমি বেদখল ও সাম্প্রদায়িক হামলার প্রশ্নে শাসকগোষ্ঠী অনেকটা পিছু হটতে বাধ্য হয়।

বলাবাহুল্য ইউপিডিএফের এই জনস্বার্থরক্ষাকারী ভূমিকা শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থের পক্ষে নয়। তারা জানে ইউপিডিএফ থাকলে সংগ্রাম থাকবে, প্রতিরোধ থাকবে; তাই অবাধে ভূমি কেড়ে নেয়া ও পাহাড়িদের অস্তিত্ব ধ্বংসের নীলনকসা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না। এ কারণে সরকার-শাসকগোষ্ঠী এত মরিয়া হয়ে পার্টির ওপর অবিরাম দমনপীড়নের স্টীমরোলার চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস শাসকগোষ্ঠীর অসৎ উদ্দেশ্য কখনই পূরণ হবে না। পার্বত্য চট্টগ্রামের বীর সংগ্রামী জনগণ অতীতে যেভাবে পার্টিকে রক্ষা করেছে, ভবিষ্যতেও যে কোন আঘাত ও অশুভ ষড়যন্ত্র থেকে তাকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসবে।

৪

আন্দোলনের এই ঝুঁকিপূর্ণ যাত্রাপথে বহু ছাত্র-যুবক-যুবা পার্টির উন্নত নীতি-আদর্শে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের সাথে যোগ দেয়। তবে আন্দোলনের জোয়ারে অনেক দুর্বলচিত্ত আত্মসিদ্ধিপরায়ন ব্যক্তিও সংগঠনে ঢুকে পড়ে, যারা পরে সময়ের সাথে সাথে চিহ্নিত হয়। সাংগঠনিক শৃঙ্খলা জোরদার এবং কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলায় আরও দৃঢ় হবার প্রয়োজন দেখা দিলে, তাদের অনেকে টিকতে পারেনি, কেউ কেউ পার্টির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে পলায়ন করেছে এবং পার্টি, জনগণ ও আন্দোলনে ক্ষতি করেছে এবং এখনও করছে। পৃথিবীর বহু সফল বিপ্লব ও আন্দোলন-সংগ্রামের ইতিহাসে দলত্যাগ ও বিশ্বাসঘাতকতার দৃষ্টান্ত রয়েছে। একটি সচল, গতিশীল ও বিপ্লবী পার্টিকে সব সময় ভেতরে থাকা সুবিধাবাদী, ধান্দাবাজ ও সুযোগসন্ধানীদের ঝেঁটিয়ে বিদায় করে সামনে অগ্রসর হতে হয়, যেভাবে একটি প্রাণীর দেহকে তার মৃত কোষগুলোকে নিষ্কাষণ করে সজীব ও বেঁচে থাকতে হয়। এ কারণে ইউপিডিএফ থেকে অনেকে ঝরে গেলেও কিংবা বিশ্বাসঘাতকতা করলেও পার্টি দুর্বল না হয়ে বরং আরও বেশী প্রাণবন্ত, সতেজ ও সংগ্রামে উজ্জীবিত হয়েছে এবং বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন ও আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীকে পরিণত হয়েছে।

আমরা দৃঢ়ভাবে বলতে চাই, ইউপিডিএফ কোন একটি নির্দিষ্ট জাতি বা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করে না। ইউপিডিএফ পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত সকল জাতিসত্তার মুক্তি ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে। পার্টি কর্মসুচির প্রথম দফাতেই স্পষ্ট করা হয়েছে যে, ইউপিডিএফ উগ্রজাতীয়তাবাদ ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ এই উভয়বিধ বাদকে প্রত্যাখ্যান করে। আমরা উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদ, উগ্র জুম্ম জাতীয়তাবাদ, উগ্র চাকমা জাতীয়তাবাদ, উগ্র মারমা জাতীয়তাবাদ ... ইত্যাদির যেমন বিরোধী, তেমনি

সংকীর্ণ জুম্ম জাতীয়তাবাদ, সংকীর্ণ চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা ... জাতীয়তাবাদেরও সমর্থক নই। কারণ উগ্র ও সংকীর্ণ এই উভয় জাতীয়তাবাদই বিভিন্ন জাতির জনগণের মধ্যে ঐক্যের পথে বড় বাধা। আমরা প্রত্যেক জাতিকে তার নিজস্ব অধিকার প্রদানের মাধ্যমে জাতিগত ঐক্য প্রতিষ্ঠার পক্ষে। বাস্তবত: এ ছাড়া দেশের মধ্যে বসবাস করা ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠার আর কোন বিকল্প কোন পথ নেই।

৫

সন্তু লারমার নেতৃত্বাধীন জনসংহতি সমিতি এক সময় আওয়ামী লীগকে "সংখ্যালঘুদের প্রতি সবচে' সহানুভূতিশীল" 'আদিবাসী বান্ধব' ..ইত্যাদি আখ্যায়িত করেছিল। তাদের এই তত্ত্ব যেমন তাদের তাত্ত্বিক বিভ্রান্তি ও রাজনৈতিক দেউলিয়াত্বের প্রতিফলন, অন্যদিকে তা আওয়ামী লীগের গণবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের ক্ষেত্রে জনগণকে নিষ্ক্রিয় ও নিরস্ত্র অবস্থায় ফেলে দেয়। জেএসএসের এই ভুল চূড়ান্তভাবে স্পষ্ট হয় যখন আওয়ামী লীগ ২০১১ সালের ৩০ জুন সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগণসহ দেশের সংখ্যালঘু জাতিগুলোর উপর উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদ চাপিয়ে দেয়।
আওয়ামী লীগ যে 'আদিবাসী বান্ধব' নয় বরং তাদের অস্তিত্ব চিরতরে লুপ্ত করে দেয়ার সুগভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, তা নীচে তুলে ধরা তার সাম্প্রতিক গণবিরোধী কার্যকলাপ থেকে বুঝে নিতে অসুবিধা হবে না।

ক) **হামলা:** স্বাধীন বাংলাদেশে পাহাড়ি জনগণের উপর হামলা আওয়ামী-মুক্তিবাহিনীই প্রথম শুরু করে। এরপর প্রত্যেকটি সরকারের আমলে এসব হামলার বিস্তার ও ফ্রিকোয়েন্সি বাড়তে থাকে। চুক্তি-পরবর্তী গত ২৪ বছরে ১৯টি বড় ধরনের হামলার ঘটনা ঘটেছে, যার মধ্যে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ঘটেছে ১৩টি। এসব হামলায় বহু পাহাড়ি প্রাণ হারিয়েছেন, নিজ জমিজমা ও বসতভিটা থেকে উচ্ছেদের শিকার হয়েছেন ও নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামে যতদিন সেনাবাহিনী ও সেটলার থাকবে ততদিন এ ধরনের সাম্প্রদায়িক হামলার আশঙ্কা থেকে যাবে।

খ) **ভূমি বেদখল:** শাসকগোষ্ঠীর একটি লক্ষ্য হলো ছলেবলে কৌশলে ও উন্নয়ন-পর্যটন-রাবার বাগান-বাঁধ ইত্যাদির নামে পাহাড়িদের জমি বেদখল করা। সেটলার হামলার পেছনের একটি বড় কারণও হলো এই ভূমি বেদখল। বান্দরবানের লামায় ম্রো-ত্রিপুরাদের ৪০০ একর জমি জবরদখলের জন্য লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ নামে বহিরাগত ভূমি দস্যুদের একটি কোম্পানি মরিয়া হয়ে

চেষ্টা চালাচ্ছে। স্থানীয় প্রশাসন এই ভূমি বেদখলে তাদের সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে প্রশাসনের সহায়তায় পাহাড়িদের হাজার হাজার একর সমষ্টিগত মালিকানাধীন জমি লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজের লোকদের মতো ভূমি দস্যুরা হস্তগত করেছে। এর ফলে সেখানে পাহাড়িদের জুম চাষের জমি সংকুচিত হওয়ায় তাদের জীবিকা চরম হুমকির মুখে পড়েছে।

লামা ছাড়াও লংগদু, নানিয়াচর, মহালছড়ি, গুইমারা, মানিকছড়ি ও কাউখালিসহ বিভিন্ন জায়গায় বহিরাগত সেটলাররা সেনাবাহিনী ও প্রশাসনের সহায়তায় পাহাড়িদের জমি কেড়ে নিতে প্রতিনিয়ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। গত ১৩ নভেম্বর সেটলার দুর্বৃত্তরা খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার পেরাছড়া ইউনিয়নে বিজিবি সেক্টর সদর দপ্তরের পাশে দুই পাহাড়ির মিশ্র ফলদ বাগান কেটে ধ্বংস করে দেয়, বাগানের একটি খামার ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয় ও অন্য একটিতে ভাঙচুর চালায়। উক্ত জমি বেদখলের উদ্দেশ্যে উক্ত হামলা চালানো হয়। ভূমি মালিকরা প্রশাসনের কাছে অভিযোগ দিলেও সেটলারদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। বিগত সরকারগুলোর মতো বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের নীতিও একই -- পার্বত্য চট্টগ্রামে নিজ মাতৃভূমিতে পাহাড়িদেরকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করে ধীরে ধীরে তাদের জাতীয় অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে দেয়া। ভূমি বেদখল ও হামলা হলো এই লক্ষ্য পূরণের অন্যতম হাতিয়ার।

গ) **বিচার বহির্ভূত হত্যা, গুম ইত্যাদি:** সরকার ইউপিডিএফের নেতৃত্বে চলমান গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমনের জন্য বিচার বহির্ভূত হত্যা, গুম, বিনা ওয়ারেন্টে ও বিনা বিচারে আটক, মিথ্যা মামলা, নির্যাতন ও জেল-জুলুমের আশ্রয় নিয়ে থাকে। চুক্তির পর আজ পর্যন্ত ২৭ জন ইউপিডিএফ সদস্য ও সমর্থক বিচার বহির্ভূত হত্যার শিকার হয়েছেন। ঢাকায় গুম হওয়া ইউপিডিএফ নেতা মাইকেল চাকমাকে সরকার এখনো উদ্ধার বা ছেড়ে দেয়নি। ইউপিডিএফ ও তার সহযোগি সংগঠনের নেতাকর্মী ও সমর্থকদের গ্রেফতার এখন নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। গত ২৪ বছরে অসংখ্য ইউপিডিএফের নেতাকর্মী ও সমর্থককে অন্যায় ও বেআইনীভাবে কারারুদ্ধ করা হয়েছে এবং এখনো অনেককে জেলে আটক রাখা হয়েছে। অন্যদিকে গ্রেফতারের পর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন এবং মিথ্যা মামলায় জড়ানো একটি নিয়মিত চর্চা। এসব মিথ্যা মামলায় আদালতে জামিন হলেও জেল গেট থেকে পুনরায় গ্রেফতার করে জেলে ঢোকানো হচ্ছে।

ঘ) **ঠ্যাঙারে বাহিনী গঠন:** শাসকগোষ্ঠী বর্তমানে নানা নামের সন্ত্রাসী ঠ্যাঙারে বাহিনী গঠন করে জনগণের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলন দমনের চেষ্টা চালিয়ে

যাচ্ছে। নব্য মুখোশ বাহিনী, তথাকথিত মগ পার্টি, কুকি-চিন পার্টি ও অন্যান্য ঠ্যাঙারে বাহিনীর সন্ত্রাস, খুন, অপহরণ, মুক্তিপণ ও চাঁদাবাজি ও অত্যাচারে জনজীবন এখন চরমভাবে অতিষ্ঠ ও অসহনীয় হয়ে উঠেছে। এইসব বাহিনী সৃষ্টির অন্য একটি উদ্দেশ্য হলো পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতিকে দেশে ও বিদেশে অস্থিতিশীল হিসেবে দেখিয়ে নিরাপত্তাজনিত কারণে সেনাবাহিনীর উপস্থিতির ন্যায্যতা ও যৌক্তিকতা তুলে ধরা। কিন্তু এসব সন্ত্রাসী ঠ্যাঙারে বাহিনীর সাথে শাসক বাহিনীর সম্পর্ক আজ প্রমাণিত সত্য। যুক্তরাজ্যের হাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (University of Hull) অধ্যাপক ভূমিত্র চাকমা তার Security Perceptions and Practices of the Indigenous People of the Chittagong Hill Tracts in Bangladesh নামক প্রবন্ধে লিখেছেন যে, ইউপিডিএফের মধ্যে তথাকথিত ভাঙন আসলে সেনা গোয়েন্দাদেরই কারসাজি।[১] একইভাবে তথাকথিত মগ পার্টি ও কুকি-চিন পার্টির গঠন, পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান ও তাদের পরিচালনার সাথেও শাসকগোষ্ঠীর একটি অংশের সম্পৃক্ততা মোটেই আর গোপন বিষয় নয়। এ বিষয়ে এখানে বিশেষ কিছু বলারও প্রয়োজন নেই।

শাসকগোষ্ঠী এই ঠ্যাঙারে বাহিনীদের দিয়ে ইউপিডিএফ সদস্য ও সমর্থকদের খুন ও অপহরণ করাচ্ছে। তাদের হাতে আজ পর্যন্ত ৪৮ জন নিহত হয়েছে। সর্বশেষ গত ৭ ডিসেম্বর রাঙামাটির নানিয়াচরে সেনা-মদদপুষ্ট সন্ত্রাসীরা ইউপিডিএফ সংগঠক সুবাহু চাকমা ওরফে গিরিকে (৫৫) সশস্ত্র হামলা চালিয়ে হত্যা করে। এর আগে ২ সেপ্টেম্বর খাগড়াছড়ির গুইমারায় তারা ইউপিডিএফ সংগঠক অংথুই মারমা ওরফে আগুনকে গুলি করে খুন করে এবং গত ২২ নভেম্বর মাটিরাঙ্গায় অনুপম চাকমা নামে অপর এক ইউপিডিএফ সদস্যকে অপহরণের পর হত্যার চেষ্টা চালায়। পুলিশ কিংবা নিরাপত্তা বাহিনী ঘটনার সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নিয়ে উল্টো হামলার শিকার ও চিকিৎসাধীন উক্ত ইউপিডিএফ সদস্যকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গ্রেফতার করে। কত নিষ্ঠুর ও অমানবিক হলে এটা করা সম্ভব তা ফ্যাসিস্ট শাসকগোষ্ঠী দেখিয়ে দিয়েছে।

ঙ) **ভ্রাতৃঘাতী সংঘাত বাঁধিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্রঃ** শাসকগোষ্ঠীর একটি গঁৎবাধা নীতি হলো আন্দোলনরত জনগণের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে

[১] *During my field interviews in 2016 with several members of the civil society in Khagrachari (who wished to remain anonymous for personal safety), they particularly emphasised the division in the United Peoples Democratic Front, allegedly instigated by the military intelligence.*

আন্তঃসংঘাত বাঁধিয়ে দেয়া ও তা জিইয়ে রাখা। শাসকদের এই অপকৌশল তখনই বড় আকারে সফল হয়, যখন আন্দোলনকারী পক্ষের একটি অংশকে তারা কিছু সুবিধা দিয়ে বাগিয়ে নিতে সক্ষম হয়। সেজন্য দেখা যায়, ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চুক্তির মাধ্যমে জেএসএসকে আঞ্চলিক পরিষদের গদি দিয়ে কব্জা করার পর আন্তঃপাহাড়ি ভ্রাতৃঘাতী সংঘাত শুরু হয়। তবে গণপ্রতিরোধ ও জনমতের চাপে এই সংঘাত সময়ে সময়ে বন্ধ থাকলেও শাসকগোষ্ঠীর 'ভ্রাতৃঘাতী সংঘাত বাঁধিয়ে দেয়ার নীতি' সকল সময় চালু থাকে। সে কারণে ২০১৫ সলের মধ্য ভাগ থেকে ৭ বছর পর্যন্ত জেএসএসের চাপিয়ে দেয়া ভ্রাতৃঘাতী সংঘাত বন্ধ থাকলেও এ বছর ১১ জুন থেকে তা আবার শুরু হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, নতুন করে এই সংঘাত শুরুর আগে জনসংহতি সমিতির একাংশের সভাপতি সন্তু লারমা ঢাকা ও রাঙামাটিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে বেশ কয়েকবার একান্ত বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। ২৮ ফেব্রুয়ারী ঢাকায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে 'শান্তি বিঘ্নকারী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা কীভাবে দূর করা যায়' সে বিষয়ে আলোচনা হয়।[২] এখানে বুঝতে অসুবিধা হয় না 'শান্তি বিঘ্নকারী ব্যক্তি ও গোষ্ঠী' বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে এবং 'প্রতিবন্ধকতা দূর' করতে কী ষড়যন্ত্র করা হয়ে থাকতে পারে।

চ) **গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ:** ইউপিডিএফ একটি গণতান্ত্রিক দল। এই পার্টি গঠনের আগে এর নেতারা পিসিপি, পিজিপি ও এইচডব্লিউএফ সংগঠনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। ইউপিডিএফের গঠনতন্ত্রের ২ নং ধারায় বলা হয়েছে: 'পার্টির লক্ষ্য হইল শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক পন্থায় পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের ন্যায্য অধিকার পূর্ণস্বায়ত্তশাসন অর্জনের মাধ্যমে অত্র অঞ্চলে শোষণ-নিপীড়নমুক্ত প্রকৃত গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।' কিন্তু সরকার ও শাসকগোষ্ঠী পার্টিকে সব সময় মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। তার শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ভণ্ডুল করে দিয়েছে অথবা তাতে বাধা প্রদান করেছে এবং বর্তমানে সকল দলীয় অফিস বন্ধ করে দিয়েছে। একটির পর একটি অফিস বন্ধ হওয়ার পরও বান্দরবানের বালাঘাটায় ইউপিডিএফের জেলা কার্যালয় কোনমতে খোলা রাখা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু তাও গত ১৩ অক্টোবর ২০২১ সন্ত্রাসীদের দিয়ে বেদখল করে নেয়া হয়েছে।[৩] পার্টি নেতাকর্মী ও সমর্থকদের বিনা অপরাধে নির্বিচার গ্রেফতারের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

---

[২] *দেখুন: পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাদের ছেড়ে দেওয়া ক্যাম্পে পুলিশ মোতায়েনের পরিকল্পনা, প্রথম আলো (Prothom alo)*

[৩] *দেখুন: গণতান্ত্রিকের দখলে ইউপিডিএফের কার্যালয় (Samakal.com)*

ছ) **সেনা অপারেশনঃ** সেনা টহল ও অপারেশনের সময় গ্রামবাসীদের হয়রানি, অর্থ লুট, বাড়ির জিনিসপত্র তছনছ ও ভাঙচুর, অহেতুক জিজ্ঞাসাবাদ, শারীরিক নির্যাতন, হুমকি এবং এমনকি গ্রেফতার পার্বত্য চট্টগ্রামে এখন প্রাত্যহিক ঘটনা। সেনারা অপারেশন ও তল্লাশীর সময় সাধারণত ঠ্যাঙারে বাহিনীর সদস্যদেরকে তাদের সঙ্গে নিয়ে থাকে।

জ) **মত প্রকাশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপঃ** স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতায় এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ অন্য যে কোন সময়ের তুলনায় বর্তমানে নিরঙ্কুশ। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের অধিকারের পক্ষে কথা বলার কারণে সিএইচটি নিউজ ডটকমের উপর বার বার আঘাত করা হয়েছে ও হয়রানিমূলক মামলা দায়ের করা হয়েছে। রাঙামাটিতে সাংবাদিক ফজলে এলাহীকে জনৈক আওয়ামী লীগ নেত্রীর দুর্নীতি সম্পর্কিত সংবাদ প্রকাশের জন্য জেলে যেতে হয়েছে। ২০২১ সালের জানুয়ারী খাগড়াছড়ির গুইমারা উচ্চ বিদ্যালয়ের এক ছাত্রকে অপহরণের সংবাদ ছাপানোর পর নব্যমুখোশ বাহিনী ও সরকারী এজেন্টদের সম্পর্ক প্রকাশিত হয়ে পড়লে[৪] কালেরকণ্ঠ পত্রিকার সংবাদদাতাকে শাসানো হয়েছে।

ঝ) **সেনা ক্যাম্প নির্মাণঃ** সরকার জনগণের উপর নিপীড়ন জোরদার করার জন্য বিভিন্ন স্থানে নতুন করে সেনা ক্যাম্প স্থাপন করেছে। এ নিয়ে স্থানীয় জনগণের সাথে তাদের বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। কাউখালির নভাঙা-দোবাকাবায় গত বছর গ্রামবাসীর জমি বেদখল করে ক্যাম্প নির্মাণ করা হলে জনগণ তার প্রতিবাদে রাঙামাটি শহরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। ফলে সরকার উক্ত ক্যাম্পটি পরে সেখান থেকে অন্যত্র সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়। এছাড়া সরকার জনগণের মতামত উপেক্ষা করে প্রত্যাহারকৃত সেনা ক্যাম্পে এপিবিএন ক্যাম্প স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ জন্য তিন জেলায় তিনটি পুলিশের এপিবিএন ব্যাটালিয়ন স্থাপন করা হবে, যার সদর দপ্তর থাকবে রাঙামাটিতে। গত ২৫ মে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল রাঙামাটিতে আইনশৃঙ্খলা মিটিঙে সরকারের এ সিদ্ধান্তের কথা জানান। ইউপিডিএফ সরকারের উক্ত সিদ্ধান্তকে পার্বত্য চুক্তির লঙ্ঘন ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের অবৈধ ১১ দফা নির্দেশনার নতুন সংস্করণ বলে মন্তব্য করে বিবৃতি দেয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামে চুক্তির মাধ্যমে সশস্ত্র সংগ্রামের ইতি ঘটার পরও বিপুল সংখ্যক সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনী মোতায়েন রাখা অত্যন্ত অযৌক্তিক; জনগণের

[৪] *https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2021/01/03/991787*

ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমনের লক্ষ্যেই যে পাহাড়ে 'অপারেশন উত্তরণ' নামে অঘোষিত সেনাশাসন জারী রাখা হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই এবং ইউপিডিএফের উপর দমনপীড়ন চালানোর মাধ্যমে তা সবার কাছে স্পষ্ট।

ক্যাম্প নির্মাণের ফলে পাহাড়িদের উচ্ছেদ হওয়ার দৃষ্টান্তও বিরল নয়। গত ২০১৪ সালের ১০ জুন দীঘিনালার বাবুছড়ায় বিজিবির ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তর নির্মাণের জন্য ২১টি দরিদ্র পাহাড়ি পরিবারকে উচ্ছেদ করা হয়। তাদেরকে এখনও ক্ষতিপূরণ কিংবা পুনর্বাসন করা হয়নি। ফলে তারা ভূমিহীন হয়ে অনাহারে অর্ধাহারে মানবেতর জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন।

ঞ) **ধর্মীয় নির্যাতন:** সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে বিভিন্ন সময় ধর্ম পালনে বাধা নিষেধ আরোপ করে। দীঘিনালায় সাধনাটিলা বনবিহার ধ্বংসের ষড়যন্ত্র এখনও অব্যাহত রয়েছে, বিহারের বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ ও মেরামতের কাজে বাধা দেয়া হচ্ছে। সেনাবাহিনীর অনুমতি ছাড়া বিহার নির্মাণ করা যাবে না বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন সময় বৌদ্ধ ভিক্ষুদের হয়রানি, নির্যাতন ও লাঞ্ছনা করা হয়েছে। বৌদ্ধ বিহারে তল্লাশী, ভাঙচুর, বিহারের পবিত্রতা নষ্ট এবং ভিক্ষুদের হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। বিহার নির্মাণে বাধা ও পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। বুদ্ধ মূর্তি লুট ও ভেঙে দেয়া হয়েছে। গত ৩১ মে ২০২১ খাগড়াছড়ির পানছড়ি উপজেলাধীন পুজগাঙ প্রজ্ঞা সাধনা বনবিহারের (আগের নাম বিনয়পুর অরণ্যকুটির) অধ্যক্ষ অগ্রজ্যোতি মহাস্থবিরের উপর সেটলার দুর্বৃত্তরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা করে ও বিহারের সম্পত্তি লুট করে নিয়ে যায়। গত ৩০ জানুয়ারি ২০২২, খাগড়াছড়ির গুগড়াছড়িতে বিশুদ্ধা মহাথের (৫২) নামে এক বৌদ্ধ ভিক্ষুকে হত্যা করা হয়। বিভিন্ন সময় ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সেনা হয়রানি করা হয়ে থাকে। কুদুকছড়িসহ বিভিন্ন স্থানে বিহারের জমি বেদখলের চেষ্টা চলছে।

ট) **ঘর-বিহার নির্মাণ-মেরামতে নিষেধাজ্ঞা:** দীঘিনালা ও সাজেকে বাড়িঘর ও বিহার নির্মাণ এবং মেরামতের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে। সেখানে পাহাড়িরা বাড়িঘর নির্মাণ বা সংস্কার করতে চাইলে বাধা দেয়া হচ্ছে। দীঘিনালা জোনের অনুমতি ছাড়া বাবুছড়া ইউনিয়ন ও দীঘিনালা ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ডে কাউকে ঘর বা বিহার নির্মাণ বা সংস্কার করতে দেয়া হচ্ছে না। এসব এলাকায় গৃহ নির্মাণ সামগ্রী নিয়ে যেতে বাধা দেয়া হচ্ছে। ফলে ৫ নং বাবুছড়া ইউনিয়নের ৩৭টি গ্রামের ২৬,৫০০ জন এবং ৪ নং দীঘিনালা ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ডের ১০টি গ্রামের ৮,০০০ জন পাহাড়ি এই অদ্ভুত,

বৈষম্যমূলক ও স্বেচ্ছাচারী নিয়মের বেড়াজালে বন্দী হয়ে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন। এর প্রতিবাদে দীঘিনালাবাসী সম্প্রতি সমাবেশ ও মানববন্ধন করেছেন। এই অন্যায় নিষেধাজ্ঞার প্রত্যাহার চেয়ে প্রধানমন্ত্রী বরাবার স্মারকলিপি দেয়ার পরও বিষয়টির সুরাহা হয়নি। ফলে জনগণ আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয়েছেন।
অপরদিকে সাজেকে বাঘাইহাট বাজার থেকে মাজলং - রুইলুই (পর্যটন) হয়ে উদয়পুর পর্যন্ত দীর্ঘ রাস্তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় ঘরবাড়ি নির্মাণ ও মেরামতে বাধা দেয়া হচ্ছে। নির্মাণ করা ঘর ভেঙে দেয়া হয়েছে। এমনকি জুম চাষ এবং বাগান বাগিচাও করতে দেয়া হচ্ছে না। সেনাবাহিনীর এই অন্যায়, অযৌক্তিক, বৈষম্যমূলক ও বেআইনী নিষেধাজ্ঞা ও বাধা প্রদানের একটাই উদ্দেশ্য: আর তা হলো পাহাড়িদেরকে তাদের নিজ এলাকা ও বসতভিটা থেকে উচ্ছেদ করে সেখানে বাঙালি সেটলারদের পুনর্বাসন করা।

ঠ) **পর্যটনের নামে উচ্ছেদ:** পর্যটন বর্তমানে পাহাড়িদের জন্য এক নতুন অভিশাপ হিসেবে দেখা দিয়েছে। বান্দরবান ও সাজেকে পর্যটন কেন্দ্র ও হোটেল-মোটেল-রিজোর্ট নির্মাণের নামে বহু পাহাড়ি পরিবারকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। এর বিরুদ্ধে ন্যায়সঙ্গত প্রতিবাদ করতে গেলে নির্মম নির্যাতন চালানো হয়েছে। সরকার খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গার আলুটিলায় পর্যটন কেন্দ্র সম্প্রসারণ (বিশেষ পর্যটন জোন) করতে চাইলে তার বিরুদ্ধে জনগণের মধ্য থেকে ব্যাপক প্রতিবাদ গড়ে ওঠে। ফলে সরকার তার পরিকল্পনা আপাতত বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছে। বান্দরবানের চিম্বুকে সেনা কল্যাণ ট্রাস্ট ও সিকদার গ্রুপ নামে একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ম্রোদের জমি দখল করে একটি পাঁচ তারা হোটেল নির্মাণের উদ্যোগ নিলে গত বছর তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ বিক্ষোভ গড়ে ওঠে। দেশ বিদেশের বিভিন্ন সংগঠন ও বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরাও এই প্রতিবাদে সামিল হন। তারপরও ম্রো জাতিগোষ্ঠীর স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর এই প্রকল্প সরকার বাতিল করেনি।

ড) **রাবার প্লান্টেশনের নামে জমি বেদখল:** সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় পার্বত্য চট্টগ্রামে অনাবাসী বাঙালিরা বান্দরবানে রাবার প্লান্টেশনের নামে গত কয়েক দশকে হাজার হাজার একর জমি বেদখল করে নিয়েছে। এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে কোন কোন কোম্পানি যেমন লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড আরও জমি কেড়ে নিতে বিভিন্ন অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। এই ভূমি দস্যুদের জমির প্রতি লোভ এত বেড়েছে যে, তারা ম্রো ও ত্রিপুরা গ্রামবাসীদের পানির উৎস ঝিরিতে বিষ দিয়ে মেরে ফেলতেও বিবেকে সামান্যতম দংশন অনুভব করে না; আগুন দিয়ে শত শত একরের প্রাকৃতিক বন ও বহু কষ্টে-শ্রমে গড়ে তোলা

বাগান বাগিচা পুড়িয়ে প্রকৃতি ও প্রাণ-বৈচিত্র্য ধ্বংস করাতো তাদের জন্য 'সামান্য ক্ষতি' মাত্র। সরকার এই ভূমি দস্যু ও বন বিনাশকারী অপরাধীদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার আইনী ব্যবস্থা না নিয়ে বরং ম্রো-ত্রিপুরাদের জমি কেড়ে নিতে তাদের সহযোগিতা করে যাচ্ছে।

ঢ) **সীমান্ত সড়ক দিয়ে ঘেরাও:** সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলায় শত শত মাইল সীমান্ত সড়কসহ যত্রতত্র রাস্তাঘাট নির্মাণের কাজ জোরেশোরে চালিয়ে যাচ্ছে। এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো পাহাড়িদেরকে চারদিক থেকে ঘেরাও করে দমন করা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের আনাচে কানাচে বাঙালি সেটলারদের অনুপ্রবেশ ও যাতায়াত সুগম করে দেয়া। এতে একদিকে যেমন সেনা টহলের নামে পাহাড়ের দূরবর্তী অঞ্চলগুলোতেও নিপীড়ন-হয়রানি বৃদ্ধি পাবে, অন্যদিকে বাঙালিদের আনাগোনাও বেড়ে যাবে। তাছাড়া গাছ ব্যবসায়ীদের তৎপরতা ও দৌরাত্ম্য বাড়বে এবং বনাঞ্চল উজার হয়ে যাবে।

ণ) **মানবাধিকার লঙ্ঘন ধামাচাপা দেয়া:** গত আগস্ট মাসে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার মিশেল ব্যাচেলেট বাংলাদেশ সফর করেন। এ সময় সরকার তাকে পার্বত্য চট্টগ্রাম সফরের অনুমতি দেয়নি। মূলত: সরকার দীর্ঘকাল ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামকে বহির্বিশ্ব থেকে আড়ালে রাখার জন্য নানাভাবে চেষ্টা চালিয়ে আসছে। এখানে নিত্য সংঘটিত ভূমি বেদখল, সেটলার হামলা, নারী ধর্ষণ, নির্বিচার গ্রেফতার ইত্যাদি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা চাপা দিতে সরকার এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। অনুমতি ছাড়া বিদেশীদের পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা, বিদেশীদের সাথে পাহাড়িদের কথা বলার ক্ষেত্রে বাধা-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। অর্থাৎ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামকে আজ দরজা জানালা বন্ধ অন্ধকারময় নির্যাতন কক্ষের মতো বানিয়ে রেখেছে, যেখানে কী ঘটছে তা বাইরের দুনিয়া জানতে পারে না। সরকারের দাবি মতে পার্বত্য চট্টগ্রামে যদি শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে তাহলে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারকে পার্বত্য চট্টগ্রাম সফরের অনুমতি দেয়া হলো না কেন?

ত) **'বিচ্ছিন্নতাবাদী' দমনের নামে জনগণের উপর নির্যাতন:** গত অক্টোবর মাসে বান্দরবানে তথাকথিত 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট (কেএনএফ)-এর বিরুদ্ধে অভিযানের নামে সেখানে সাধারণ জনগণের উপর অত্যাচার চালানোর অভিযোগ রয়েছে। অভিযানের কারণে ২৭০ জন পাহাড়ি নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধ ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে ভারতের মিজোরামে আশ্রয়

নিয়েছেন[৫] এবং আরও কয়েক হাজার লোকজন দেশের ভেতরে বনে-জঙ্গলে অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হয়ে জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন বলে জানা গেছে।[৬] একটি বিশেষ স্বার্থান্বেষী মহল কর্তৃক কুকি-চিন পার্টির সৃষ্টি এবং তারপর সেই পার্টিকে দমনের নামে সাধারণ জনগণকে উৎপীড়ন, হয়রানি ও দেশছাড়া করা -- শাসকগোষ্ঠীর পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাহাড়ি-শুন্য করার ষড়যন্ত্র ছাড়া কিছুই হতে পারে না। সরকারের উচিত অবিলম্বে বান্দরবানে তথাকথিত 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' দমনের নামে বম জাতিগোষ্ঠী তথা সাধারণ পাহাড়ি জনগণের উপর দমনপীড়ন বন্ধ করা এবং মিজোরামে আশ্রিতদের ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা।

থ) **ইসলামীকরণঃ** পার্বত্য চুক্তির পর পাহাড়ে ইসলামীকরণ প্রক্রিয়া জোরদার হয়েছে। বান্দরবানে সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠী ত্রিপুরা ও ম্রোদের বিশেষভাবে টার্গেট করে নানা কৌশলে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে সেখানে পাহাড়িদের সমাজে অহেতুক বিভক্তি ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে। ফলশ্রুতিতে গত বছর (২০২১) ১৮ জুন রোয়াংছড়িতে এক ত্রিপুরা প্রাণ হারান। ধর্মান্তরকরণের জন্য শাসকগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় বেশ কিছু ইসলামিক এনজিও বর্তমানে সক্রিয় রয়েছে বলে জানা গেছে। এরা নানা প্রলোভন দেখিয়ে ও মিথ্যা বলে ম্রো ও ত্রিপুরাসহ সংখ্যালঘু পরিবারের কোমলমতি শিশুদের শিক্ষা দেয়ার নামে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন মাদ্রাসায় নিয়ে গিয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করছে। এ সংক্রান্ত শিশু পাচারের খবর মাঝে মধ্যে দেশের মূলধারার পত্রপত্রিকায়ও প্রকাশিত হয়ে থাকে।

সরকার একদিকে পাহাড়ি জাতিগুলোর নিজস্ব সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের গালভরা বুলি কপচিয়ে থাকে, অন্যদিকে ইসলামীকরণ প্রক্রিয়ায় সহায়তা দিয়ে পাহাড়ি সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্ম ধ্বংস করে চলেছে। সরকারের এই দ্বিমুখী আচরণ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।

৬

সরকার প্রতি বছর ২ ডিসেম্বর ঘটা করে পার্বত্য চুক্তির বর্ষপূর্তি পালন করে থাকে। এ বছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। রাঙামাটির সাজেকে বাঘাইহাট জোনের সেনারা লোকজনকে চুক্তির বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে লোকজনকে বাধ্য করে।

---

[5] *https://thediplomat.com/2022/11/kuki-chin-refugees-from-bangladesh-take-shelter-in-mizoram/*

[6] *https://nenow.in/north-east-news/mizoram/mizoram-cabinet-decides-to-extend-humanitarian-aid-to-kuki-chin-people.html*

তথাকথিত আনন্দ মেলা, আনন্দ র‍্যালি, কনসার্ট, ইত্যাদির আয়োজন করে সরকার এই বার্তা দিতে চায় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ফিরে এসেছে। কিন্তু অপরদিকে এই সরকারই বিদেশীদের পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশে বাধা নিষেধ আরোপ করেছে, আর কোন কোন ক্ষেত্রে প্রবেশের অনুমতি দিলেও স্বাধীনভাবে ঘুরতে দেয় না। পার্বত্য চট্টগ্রামে যদি চুক্তির মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েই থাকে, তাহলে সরকারের এই ব্যবস্থা কেন? পাহাড়ে যদি শান্তি বজায় থাকে, তাহলে এত বিপুল সংখ্যক সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনীর উপস্থিতি কেন? কেনই-বা তিন জেলায় তিনটি এপিবিএন ব্যাটালিয়ন ও র‍্যাবের স্থায়ী ব্যাটালিয়ন মোতায়েন করতে হবে? সরকারের এ কয়টি পদক্ষেপের মাধ্যমেই কি পরিস্কার হয় না যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি আজও পূর্বের মতো অশান্ত?

সরকারি বক্তব্য-বিবৃতি, প্রচার-প্রচারণায় পার্বত্য চট্টগ্রামে যে শান্তির বাতাবরণ তৈরি হয়েছে বলে দাবি করা হয়, সেটা আসলে শাসকগোষ্ঠীর নীলনক্সা অনুসারে প্রস্তুত অদ্ভূত শান্তি -- যে 'শান্তির' দৌরাত্ম্যে ঘরবাড়ি ভিটেছাড়া হয়ে পাহাড়ি জনগণের নাভিশ্বাস উঠছে, আর সেনা ছত্রছায়ায় সেটলাররা পাহাড়িদের জমি বেদখল করে নিচ্ছে।

অপরদিকে জেএসএসের মহা করুণ ও অসহায় অবস্থা সবচেয়ে বেশী জ্বলজ্বল করে ফুটে উঠে এই ২ ডিসেম্বর। এদিন তারা চুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়ার জন্য কান্নাকাটি করে, সরকার তাদের সাথে প্রতারণা করেছে বলে অভিযোগ করে, কিন্তু তারা চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে কার্যকর কোন আন্দোলন গড়ে তোলে না। তারা বুঝতে পারে না যে, চুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়ার অন্যতম কারণ নিহিত রয়েছে তাদের নিজেদের ভুল রাজনীতি ও সুবিধাবাদিতার মধ্যে। তারা যদি ভ্রাতৃঘাতী সংঘাতে নিজ জ্ঞাতি ভাইদের হত্যা না করে চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলন চালিয়ে যেতো, তাহলে সরকার এতদিন চুক্তি বাস্তবায়ন করতে বাধ্য হতো। কাজেই চুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়ার জন্য জেএসএস নেতৃত্বও সরকারের সাথে সমানভাবে দোষী।

সরকার বক্তব্য-বিবৃতিতে যাই বলুক, মিডিয়ায় যাই প্রচার করুক, চুক্তির বর্ষপূর্তি পালনে যত জমকালো অনুষ্ঠান আয়োজন করুক, প্রকৃত সত্য হলো পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি আসেনি। কিন্তু কেন ১৯৯৭ সালে চুক্তি স্বাক্ষরের ২৫ বছর পরও পাহাড়ে শান্তি আসেনি? শান্তি না আসার কারণ: ১) চুক্তিটির অন্তর্নিহিত দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা, ২) জনগণের ন্যায্য অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে যাতে আন্দোলন গড়ে উঠতে না পারে তার জন্য ইউপিডিএফের উপর নিষ্ঠুর দমনপীড়ন চালানো, ৩) সরকারের পাহাড়ি বিরোধী নীতি, ভূমি বেদখল, পাহাড়িদের উচ্ছেদের জন্য একের পর এক সাম্প্রদায়িক হামলা, ৪) পার্বত্য চট্টগ্রামে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি ও জিইয়ে রেখে বিশাল সামরিক বাহিনীর উপস্থিতির বৈধতা দেয়ার চেষ্টা, ৫) এই লক্ষ্যে তথাকথিত

মগ পার্টি, কুকি-চিন পার্টি, মুখোশ বাহিনীসহ নানা রঙের ঠ্যাঙারে বাহিনী সৃষ্টি করা ও তাদেরকে দিয়ে পরিস্থিতিকে অস্বাভাবিক ও অস্থিতিশীল করে তোলা, ৬) ইউপিডিএফের নেতৃত্বে পরিচালিত গণতান্ত্রিক গণআন্দোলন দমনের জন্য জেএসএসের উভয় গ্রুপকে এবং ২০১৭ সালের ১৫ নভেম্বর গঠিত নব্যমুখোশ বাহিনীকে ব্যবহার করা।

এক কথায়, সন্তু লারমা স্বাক্ষরিত পার্বত্য চুক্তির ফল হলো: একদিকে সরকার-সেনাবাহিনীর আনন্দ উৎসব, আর অন্যদিকে পাহাড়িদের মধ্যে বিভেদ, রক্তক্ষয়ী সংঘাত, ঘরে ঘরে করুণ আর্তনাদ, একের পর এক সাম্প্রদায়িক হামলায় ক্ষতবিক্ষত হওয়া এবং ভূমি হারানো। একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে, পার্বত্য চুক্তির পরই কোন কোন এলাকায় পাহাড়িরা সবচেয়ে বেশী ভূমি বেদখলের শিকার হয়েছে এবং রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও রামগড় শহর এলাকাসহ জনকেন্দ্রগুলোতে (পপুলেশন সেন্টার) বহিরাগত বাঙালিদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে তারা দ্রুত সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের আজ এই পরিণতি দেখে যে কোন নিরপেক্ষ বিশ্লেষক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য যে, ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চুক্তি হলো আসলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সামরিক বিজয়ের স্মারক আর জেএসএসের জন্য তা আত্মসমর্পণের দলিল ভিন্ন আর কিছুই নয়।

৭

দেশে সাধারণ নির্বাচনের আরও মাত্র এক বছর বাকি। কিন্তু এর মধ্যে রাজনৈতিক মাঠ উত্তপ্ত হতে চলেছে। বিরোধী দল বিএনপি বিভাগীয় শহরগুলোতে সরকারি নানা বাধা সত্বেও সফলভাবে জনসমাবেশ করতে সক্ষম হয়েছে। এতে তাদের দলের নেতাকর্মীদের মনোবল বেড়েছে। বিরোধী দল চায় একটি নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন। বিগত দু'টি নির্বাচনেও তারা একই দাবিতে আন্দোলন করেছিল, কিন্তু তাতে সফল হয়নি। ২০১৪ সালের দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন তারা বর্জন করলেও একাদশ সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। আওয়ামী লীগ উক্ত দু'টি নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির মাধ্যমে জয়লাভ করে। আগামী দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনেও আওয়ামী লীগ একই কায়দায় জয়ী হয়ে ক্ষমতায় যেতে চায়। সরকার বিরোধী দলের নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি মানতে রাজী নয়। অন্যদিকে বিরোধী দলসহ সবার কাছে পরিস্কার যে, আওয়ামী লীগের অধীনে নির্বাচন সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এ কারণে গত দু'টি নির্বাচনের অভিজ্ঞতা থেকে যদি বিএনপি কোন শিক্ষা নিয়ে থাকে, তাহলে তার পক্ষে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ছাড়া নির্বাচনে যাওয়া সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশের রাজনীতি অনিবার্যভাবে ভয়াবহ সংঘাত,

সংঘর্ষ ও অনিশ্চয়তার দিকে ধাবিত হতে বাধ্য। ইতিমধ্যে সেই আলামত দেখা যাচ্ছে। গত ৭ ডিসেম্বর রাজধানীর নয়া পল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে পুলিশী হামলায় একজন নিহত হয়েছে। এমনকি গত ৮ ডিসেম্বর রাতে পুলিশ দলটির মহাসচিব মির্জা ফকরুল ইসলাম আলমগীর ও স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাসকে গ্রেফতার করেছে। ১০ ডিসেম্বর সংসদ থেকে বিএনপির সাত সাংসদের পদত্যাগ এবং ঢাকার সমাবেশ থেকে সরকারের পদত্যাগ ও দলনিরপেক্ষ অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনসহ দশ দফা দাবি ঘোষণার পর বিএনপির আর পেছনে যাওয়ার রাস্তা রইল না।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে প্রথম যে দলটি আন্দোলন করেছিল তা হলো আওয়ামী লীগ। তখন ক্ষমতাসীন বিএনপি প্রথমে এই দাবি মেনে নেয়নি। বরং ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে একতরফা প্রহসনমূলক নির্বাচনের আয়োজন করে। প্রবল গণআন্দোলনের মুখে পরে বিএনপি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয় এবং সংবিধানে ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা কায়েম করে। সে বছর ১২ জুন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি হাবিবুর রহমানের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পেয়ে আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টির সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করে। এরপর ২০০১ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিএনপি জয়ী হয়। ২০০৬ সালে বিএনপি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিজের পছন্দের ব্যক্তিকে কারসাজি করে মনোনীত করতে চাইলে রাজনৈতিক পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠে এবং এক পর্যায়ে সেনাবাহিনী কার্যত ক্ষমতা দখল করে দেশে জরুরি অবস্থা জারি করে, যা ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত নির্বাচন পর্যন্ত বলবৎ থাকে। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ "ভূমিধস বিজয়" অর্জন করে সরকার গঠন করে। ২০১১ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের সময় বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিলের পক্ষে রায় দেয় এবং একই বছর সরকার সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে এ ব্যবস্থাকে পুরোপুরি তুলে দেয়।

ইতিহাসের নির্মম পরিহাস হলো এই যে, যে দলটি এক সময় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি মেনে নিতে চায়নি, সে দলটি (বিএনপি) আজ একই দাবিতে আন্দোলন করতে বাধ্য হচ্ছে। অন্যদিকে যে দলটি (আওয়ামী লীগ) দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয় না এমন অভিযোগ তুলে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আন্দোলন করেছে, সেই দলটি এখন সেই দাবি মানতে রাজী নয়। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, নাম ভিন্ন হলেও উভয় দলের মৌলিক চরিত্র হলো মূলত একই। কোনভাবে ক্ষমতায় গেলে তারা নানা কারসাজি, ছলচাতুরী করে সেই ক্ষমতা ধরে রাখতে চায় -- এমনকি দেশকে চরম সংকটের মুখে ফেলে দিয়ে

হলেও। এ কারণে এদেশে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং একটি স্বাধীন ও উপযুক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন নির্বাচন কমিশনের অধীনে ছাড়া কোন নির্বাচন সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

তবে এক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি কিছুটা ভিন্ন। অঘোষিত সেনা শাসন ও নিয়ন্ত্রণ তুলে নেয়া না হলে এবং ইউপিডিএফের ওপর চলমান দমনপীড়ন বন্ধ না হলে দেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও এখানে নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ হতে পারে না।

৮

বর্তমানে আওয়ামী লীগের দুঃশাসনে দেশের জনগণ হাঁসফাস করছেন। দফায় দফায় তেল-গ্যাস-বিদ্যুত ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রসহ সকল পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি, পরিবহন ভাড়া বৃদ্ধি ও মূদ্রাস্ফীতির কারণে জনদুর্ভোগ চরমে পৌঁছেছে। জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণ। ফলে নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পক্ষে সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়েছে। সরকারের দুর্নীতি, লুটপাট ও অব্যবস্থাপনার কারণে দেশের অর্থব্যবস্থা ধ্বসে পড়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকে বৈদেশিক রিজার্ভের পরিমাণ আশঙ্কাজনক মাত্রায় কমেছে, রপ্তানি আয় ও রেমিটেন্স কমেছে, ডলার সংকট সৃষ্টি হয়েছে। এ অবস্থায় সরকার আন্তর্জাতিক মুদ্র তহবিল বা আইএমএফ থেকে ৪৫০ কোটি ডলারের ঋণ নিয়ে চলমান অর্থনৈতিক সংকট থেকে উত্তরণের চেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু আইএমএফের পরামর্শে অর্থনীতিতে যে সংস্কার সরকারকে করতে হবে তার ফলে জনগণের অবস্থা আরও খারাপ হতে বাধ্য। ইতিমধ্যে বিদ্যুতের পাইকারী মূল্য বাড়ানোর সিদ্ধান্তের মাধ্যমে তার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। এভাবে আর দেশ চলতে পারে না। নতুন সংবিধান ছাড়া জনগণের আর কোন গত্যন্তর নেই।

৯

দেশের অর্থনীতির যখন এই দশা তখন প্রতিদিন কোটি কোটি টাকা খরচ করে কেবলমাত্র জাতিগত নিপীড়ন জারি রাখা ও ইউপিডিএফকে দমনের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে বিপুল সংখ্যক সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনীর সদস্য নিয়োজিত রাখা অত্যন্ত অযৌক্তিক, অপরিণামদর্শী, অবিবেচনাপ্রসূত ও অগ্রহণযোগ্য। কেবল চুক্তি-পরবর্তী ২৫ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা মোতায়েন রাখার জন্য যে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে, তা যদি উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করা হতো তাহলে আজ পার্বত্য চট্টগ্রামের চিত্র ভিন্ন রকম হতো। পাহাড়ে সশস্ত্র সংগ্রাম বা সেনাবাহিনীর ভাষায় ইন্সার্জেন্সি না থাকার পরও অপারেশন উত্তরণ নামে চুক্তি-পূর্ব পরিস্থিতির মতো কাউন্টার-ইন্সার্জেন্সির কৌশল প্রয়োগের উদ্দেশ্য হলো একটাই -- আর তা হলো ইউপিডিএফের গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমন করা।

কিন্তু ইউপিডিএফ শুরু থেকেই দেশের অন্যান্য গণতান্ত্রিক দলগুলোর মতো গণতান্ত্রিক পন্থায় জনগণের ন্যায্য অধিকার পূর্ণস্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়ে আসছে। কিন্তু তারপরও পার্টিকে ধ্বংস করতে হাজার হাজার সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনী নিয়োজিত ও সক্রিয় রাখা হয়েছে। তবে শাসকদের মনে রাখা দরকার, যে জাতি একবার জেগে ওঠে তাকে আর ঘুম পাড়িয়ে রাখা যায় না। বলদর্পী শাসক হিটলার গ্যাস চ্যাম্বারে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালিয়েও ইহুদিদের নিশ্চিহ্ন করতে পারেনি। দক্ষিণ আফ্রিকায় মুক্তিকামী নেলসন মেন্ডেলাদের দমিয়ে রাখতে পারেনি বর্ণবাদী শ্বেতাঙ্গ শাসকরা। ৭১ সালে হত্যা-ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে উগ্র ধর্মান্ধ পাঞ্জাবিরা ঠেকাতে পারেনি বাঙালিদের স্বাধীনতা।

বাংলাদেশের শাসকদের উচিত ইতিহাসের এইসব ঘটনা থেকে শিক্ষা নেয়া এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের সাথে বোঝাপড়া করে তাদের ন্যায্য দাবি পূর্ণস্বায়ত্তশাসন মেনে নেয়া।

১০

ইউপিডিএফ দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাধীনে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার স্থায়ী সমাধান চায়। দলের নেতা-কর্মী-সমর্থকদের নির্বিচারে ধরপাকড়, মিথ্যা মামলা দিয়ে ঘরছাড়া করা, ভাড়াটে সশস্ত্র সন্ত্রাসী দিয়ে ওঁৎ পেতে হত্যা ও দলীয় অফিস বন্ধ করে দিয়ে নিষ্ঠুর দমন-পীড়ন জারি থাকলেও ইউপিডিএফ শান্তিপূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় আন্দোলন সংগ্রাম সংগঠিত করছে এবং নেতৃত্ব দিচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানে ইউপিডিএফ-এর নীতিগত দৃঢ়তা ও নিষ্ঠা রাজনীতি সচেতন প্রতিটি ব্যক্তি প্রত্যক্ষ করছেন। দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিদেরও এ দিকটি দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। এমনি প্রেক্ষাপটে জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থে শান্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সরকারের সাথে সংলাপ প্রক্রিয়া চালানোর প্রস্তাব উত্থাপিত হলে, নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় আন্দোলনরত দল হিসেবে ইউপিডিএফ তাতে সম্মতি জানায়। এ প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতায় প্রাথমিক পর্যায়ে সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে ইউপিডিএফ প্রতিনিধিদের দু'দফায় বৈঠক হয়েছে। সমাধানের ব্যাপারে ইউপিডিএফ-এর আন্তরিকতার নিদর্শনস্বরূপ পার্বত্য চট্টগ্রামে দমন-পীড়ন জারি থাকলেও বৈঠকে অংশ নেয় এবং মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে দাবিনামাও পেশ করেছে। এটিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে পথরেখা হিসেবে ধরে নেয়া যায়। কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হলো, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সরকারের আন্তরিকতা নিয়ে আবারও সন্দেহ তৈরি হয়েছে।

১১

পার্বত্য চট্টগ্রামে যে নিপীড়ন চলছে, ভূমি বেদখলের মহোৎসব চলছে, পাহাড়িদের

নিজ মাতৃভূমিতে সংখ্যালঘু ও অস্তিত্বহীন করার আয়োজন চলছে, চুক্তি-পরবর্তী সময়ে তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ইউপিডিএফ ছাড়া আর অন্য কোন পার্টি এগিয়ে আসেনি। জেএসএসের দুই গ্রুপ, পাহাড়ি আওয়ামী লীগার ও পাহাড়ি বিএনপিওয়ালারা সবাই নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত। জনগণের জীবন-মরণ সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামানোর, তাদের পক্ষে কাজ করার সময় তাদের নেই। জনগণের কী হলো, জাতি ধ্বংস হলো কীনা এসব নিয়ে ভাবার জন্য তারা রাজনীতি করে না। এটাই হলো আজকের পার্বত্য চট্টগ্রামের নির্মম বাস্তবতা। এক কথায় ইউপিডিএফ ছাড়া জনগণের আর কোন বন্ধু নেই, তাদের পাশে আর কেউ নেই। ইউপিডিএফ-ও জাতি ও জনগণের এই চরম দুর্দিনে সব সময় তাদের সাথে থেকে তার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করে চলেছে।

গত ২৪ বছরের সংগ্রামে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, সঠিক নীতি আদর্শে সুসজ্জিত একটি পার্টি ছাড়া ভূমি বেদখল ও রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব নয় এবং যখনই পার্টির নেতৃত্বে জনগণ সংগঠিত হয়ে লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তখনই সফলতা অর্জিত হয়েছে। কাজেই আসুন ইউপিডিএফের নেতৃত্বে চলমান লড়াইকে আরও বিস্তৃত, সুসংগঠিত ও জোরদার করি এবং জনগণের বহু কাঙ্ক্ষিত পূর্ণস্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত করি।

এটা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, দেশের বর্তমান সংবিধান অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী মৌলবাদী আদর্শকে প্রাধান্য দিয়ে রচিত এ সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সমতল অঞ্চলের সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের স্বীকৃতি নেই এবং তাদের অধিকার রক্ষিত হয়নি। তাই **পার্টি প্রতিষ্ঠার দুই যুগপূর্তিতে ইউপিডিএফ দ্ব্যর্থহীনভাবে নিম্নোক্ত দাবি তুলে ধরতে চায়:**

- জনগণের নতুন সংবিধান রচনা করতে হবে, যে সংবিধান হবে গণতান্ত্রিক এবং যেখানে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগণের পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের অধিকারসহ দেশের জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা হবে।

- অবিলম্বে সংসদ ভেঙে দিয়ে একটি নির্দলীয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনপূর্বক অবাধ নির্বাচন দিতে হবে। গঠিতব্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

- রাজনৈতিক দলের ওপর দমন-পীড়ন বন্ধ করে শান্তিপূর্ণ সভা-সমাবেশের অধিকার দিতে হবে।

- দালাল পুনর্বাসন কেন্দ্র বলে পরিচিত 'তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ' ভেঙে দিয়ে নির্বাচন দিতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে।

- দেশের একটি বিশেষ অঞ্চল পার্বত্য চট্টগ্রামে অশান্ত অবস্থা দূর করতে অবিলম্বে একটি সর্বদলীয় জাতীয় কমিটি গঠনপূর্বক পূর্ণস্বায়ত্তশাসন প্রদানের বিধি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

- পাহাড়ে তথাকথিত সেনা অভিযানের নামে চলমান দমন-পীড়ন বন্ধ করতে হবে এবং মিজোরামে আশ্রিত ও আভ্যন্তরীণভাবে উদ্বাস্তু বম শরণার্থীদের সম্মানের সাথে ফিরিয়ে এনে পুনর্বাসন করতে হবে।

- 'অপারেশন উত্তরণ' নামে অঘোষিত সেনা শাসন তুলে নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনা প্রত্যাহার করতে হবে।

- সেনাবাহিনীকে জাতিগত নিপীড়ন ও ভূমি বেদখলের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।

- কারাবন্দী ইউপিডিএফ কেন্দ্রীয় নেতা আনন্দ প্রকাশ চাকমাসহ রাজনৈতিক কারণে আটক সকল রাজবন্দীকে নিঃশর্ত মুক্তি এবং দায়েরকৃত মিথ্যা মামলা-হুলিয়া তুলে নিতে হবে।

- সেটলারদের পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সরিয়ে নিয়ে সমতলে জীবিকার নিশ্চয়তাসহ সম্মানজনকভাবে পুনর্বাসন করতে হবে।

- দীঘিনালা ও সাজেকে বাড়িঘর ও বিহার নির্মাণ ও মেরামতের উপর সেনাবাহিনীর বেআইনী নিষেধাজ্ঞা ও বাধা-নিষেধ তুলে নিতে হবে।

- পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত তেল-গ্যাস খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও উত্তোলন বন্ধ রাখতে হবে।

- রোহিঙ্গা শরণার্থীদের তাদের নিজ দেশে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করতে হবে।

- সমতলে মৎসজীবীদের মতো পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রান্তিক জুমচাষীদের জন্যও বিশেষ প্রণোদনা দিতে হবে।

- শিক্ষক নিয়োগে জেলা পরিষদের অনিয়ম ও দুর্নীতি বন্ধ করে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে সর্বত্র আওয়াজ তুলুনঃ

- ২০১৮ সালে স্বনির্ভর হত্যাকাণ্ডসহ ইউপিডিএফ সদস্য ও সমর্থকদের খুনের বিচার কর।

- ঢাকায় রাষ্ট্রীয় বাহিনীর গুমের শিকার ইউপিডিএফ সংগঠক মাইকেল চাকমার সন্ধান দাও।

- জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর ইউপিডিএফ সদস্য সমর্থকদের জেল গেট থেকে পুনরায় গ্রেফতার ও নতুন মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে আটক দেখানো বন্ধ কর।

- নব্যমুখোশ বাহিনী, মগ পার্টি ও কুকি-চিন পার্টিসহ রাষ্ট্রীয় মদদপুষ্ট সকল ঠ্যাঙারে বাহিনী ভেঙে দাও; এসব বাহিনীর সদস্য ও তাদের গডফাদারদের

গ্রেফতার ও বিচার কর।

- আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলোকে পার্বত্য চট্টগ্রামে অবাধে প্রবেশ, চলাচল ও তথ্য সংগ্রহের অনুমতি দাও।

- অবিলম্বে মাইসছড়ি, লংগদু, মানিকছড়ি, পেরাছড়া ও লামাসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি বেদখল বন্ধ কর, বেদখলকৃত জমি ফিরিয়ে দাও, বেদখলকারী সেটলারদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ কর।

- বান্দরবানে লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড কর্তৃক ম্রো-ত্রিপুরাদের ৪০০ একর জমি বেদখলের ষড়যন্ত্র ও তৎপরতা বন্ধ কর, বন ও পরিবেশ ধ্বংসের জন্য দায়ি কোম্পানির বিচার কর।

- দীঘিনালার বাবুছড়ায় বিজিবি কর্তৃক উচ্ছেদ হওয়া ২১ পরিবারের জমি ফিরিয়ে দাও, তাদেরকে ক্ষতিপূরণসহ পুনর্বাসন কর।

- পর্যটন, উন্নয়ন, সেনা ক্যাম্প নির্মাণ ও সম্প্রসারণ, রাবার চাষ ইত্যাদির নামে পাহাড়ি উচ্ছেদ বন্ধ কর।

- সীমান্ত সড়ক নির্মাণের নামে পাহাড়িদের ঘেরাও করে মারার ষড়যন্ত্র বন্ধ কর।

- পার্বত্য চট্টগ্রামে নারী ধর্ষণ বন্ধ কর, এযাবত সংঘটিত সকল ধর্ষণ ঘটনার বিচার কর, দোষীদের শাস্তি দাও।

- ভারত-প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদেরকে তাদের নিজ জমিতে পুনর্বাসন কর; অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের ক্ষতিপূরণসহ পুনর্বাসন কর।

- বৌদ্ধ বিহারে হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট, ভিক্ষুদের খুন, হয়রানি, ধর্মীয় পরিহানি-অবমাননা ও ধর্ম পালনে বাধা-নিষেধ ও হস্তক্ষেপ বন্ধ কর।

ছাত্র-যুব সমাজের প্রতি আহ্বানঃ

- অবমাননাকর "উপজাতি" শব্দ বর্জন করুন। নিজ নিজ পাড়া-গ্রাম, সংগঠন, প্রতিষ্ঠানের লেটার প্যাড, সাইনবোর্ড থেকে আপত্তিকর শব্দ তুলে দিন!

- যে সকল প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়া পাহাড়িদের হেয় ও তাচ্ছিল্য করে সংবাদ প্রচার করে, তার প্রতিবাদ জানান, প্রয়োজনে তাদের বয়কট করুন!

- ইসলামিক অভিধায় 'মো:' ও 'বেগম' সম্বোধন মেনে নেবেন না! সরকারি পত্রে এ ধরনের সম্বোধন থাকলে তার প্রতিবাদ করুন!

- যে সকল স্থানের নাম বিকৃত হয়েছে, অথবা সরকারি উদ্যোগে ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত করা হয়েছে, সে সবের পূর্ব নাম চালু করুন!

- অপসংস্কৃতি, নেশা দ্রব্য ছড়িয়ে যুবসমাজকে রসাতলে নেয়ার সরকারি নীলনক্সা ভেস্তে দিতে সক্রিয় হোন!

- ইন্টারনেটে জুয়ার বিরুদ্ধে সতর্ক হোন!

- সমাজে আন্তঃজাতিসত্তাসমূহের ঐক্য ও সংহতি জোরদারে ভূমিকা রাখুন!

সরকারি-আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যেঃ

- পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের ঐতিহ্য, রীতি-সংস্কৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করুন!
- দাপ্তরিক যোগাযোগ ও কাগজপত্রে পাহাড়িদের ইসলামিক অভিধায় 'মোঃ' 'বেগম' সম্বোধন করবেন না!
- জনগণের ওপর ফ্যাসিবাদী সরকারের অন্যায় নির্দেশ চাপিয়ে দেবেন না!
- জনগণের সাথে বৈরী আচরণ করবেন না!
- স্থানীয় নিম্ন পদস্থ কর্মচারিদের সাথে দুর্ব্যবহার করবেন না!
- পাহাড়িদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ ও সেটলারদের প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণ করবেন না!

সেনা ও রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বানঃ

- পেশাগত মর্যাদা সম্মুন্নত রাখুন!
- দুর্নীতিগ্রস্ত সেনা কর্মকর্তাদের সাথে দূরত্ব বজায় রাখুন!
- প্রমোশনলোভী অযোগ্য কর্মকর্তাদের অবৈধ কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়ে নিজেদের মর্যদা ক্ষুন্ন করবেন না!
- কায়েমী স্বার্থবাদী চক্রের সাথে যুক্ত সেনা কর্মকর্তাদের ক্রীড়নক হবেন না!
- পেশাগত দায়িত্বের বাইরে অবৈধ ও অন্যায় নির্দেশ পালন করবেন না!
- মানবতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধী অপকর্মে লিপ্ত হবেন না, অন্যদেরও বিরত রাখুন!
- এলাকার বয়ঃজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি, হেডম্যান, চেয়ারম্যান জনপ্রতিনিধিদের সাথে অশোভন আচরণ করবেন না!
- পাহাড়িরা আপনাদের শত্রু নয়, দেশের নাগরিক হিসেবে তাদের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় ভূমিকা রাখুন!
- পাহাড়িদের প্রতি বিমাতাসুলভ, বৈষম্যমূলক ও বৈরী আচরণ এবং সেটলারদের প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণ বন্ধ করুন!

সেটলারদের প্রতি আহ্বান

- আপনাদের অসহায়ত্বকে পুঁজি করে যারা ব্যবসা করছে, তাদের চিনে রাখুন!
- আপনাদের ন্যায্য পাওনা আত্মসাৎকারী সেটলার সর্দার, ব্যবসায়ী, সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তাদের জালিয়াতির বিরুদ্ধে মুখ খুলুন!
- "বাঙালি" জিগির তুলে যারা পাহাড়ি জনগণের বিরুদ্ধে আপনাদের লেলিয়ে দেয়, তাদের থেকে সাবধান হোন!

- নিজেদের কায়েমী স্বার্থে যারা আপনাদের লাঠিয়াল হিসেবে ব্যবহার করে, তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান!

- সমতলে যারা শোষণ-নির্যাতন, খুন-খারাবি ও চর দখল করে, তারা পাহাড়ে "বাঙালি দরদী" সেজে ফায়দা লুটছে, তাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত হোন!

সেনা মদদপুষ্ট বিপথগামীদের উদ্দেশ্যে:

- সেনা কর্মকর্তাদের গুটি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে নিজের ধ্বংস ডেকে আনবেন না! স্বজাতির বিরুদ্ধে গিয়ে কেউই টিকতে পারে নি।

- '৯৫ সালে মুখোশবাহিনী, বোরখা পার্টি, '৭১-এর রাজাকার আলবদরদের পরিণতি থেকে শিক্ষা নিন!

- অনতিবিলম্বে অপরাধীচক্রের সংশ্রব ত্যাগ করুন!

- স্ব স্ব এলাকায় ইউপিডিএফ-এর স্থানীয় ইউনিটসমূহের সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা মেনে সমাজে ফিরে আসুন!

মুক্তিকামী জনগণের বিজয় অনিবার্য!
No Full Autonomy, No Rest!
Long Live UPDF!

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)
কেন্দ্রীয় কমিটি

ইউপিডিএফ-এর কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত। ২০ ডিসেম্বর ২০২২।